ঈশ্বরের ঈশ্বর ভাবনা

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরের ভাবনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃত কী ছিলেন, এ নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে।তাঁকে নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে এবং তা এখনো চলছে। কিন্তু এখনও অবধি কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি প্রকৃত কী ছিলেন? নাস্তিক নাকি আস্তিক? ঈশ্বর বিষয়ে উদাসীন নাকি অজ্ঞেয়বাদী? তাই একেকজন তাঁকে একেক রকম ভাবে বর্ণনা করছেন। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে যে যেমন বুঝেছেন তিনি তেমনি লিখেছেন। নিজেকে কখনো কোন ধরাবাঁধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আমাদের সামনে ধরা দেননি। কার্যত তিনি এর বিরোধী ছিলেন।কোনো ধরাবাঁধা ছাঁচে ফেলা জীবন ছিল না তাঁর। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণভাবে নিয়ম অনুশাসনের অনুসারী। মানবতাবাদ বা পরহিতবাদ ছিল তাঁর মূল ধর্ম।

সূচক শব্দ:অজ্ঞেয়বাদী, মানবতাবাদী, একেশ্বরবাদ, নৈতিকতা, নিস্কাম কর্ম।

লেখক

ড. অভিজিৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত
abhijitsarkar.philo@gmail.com

মূল প্রবন্ধ

বাঙালির ঈশ্বর নাকি স্বয়ং ঈশ্বর বিরোধী বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী! যিনি স্বয়ং মনুষ্যত্বের প্রতিমূর্তি তার কি আর কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়ে? বারবার প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বরচন্দ্র কি ঈশ্বর বিরোধী? নাকি সংশয়বাদী? নাকি তিনি নাস্তিক? তবে এটা সত্য যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগর নামেই পরিচিত হয়েছেন- তিনি সেই অর্থে ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। এমনকি পিতামহ রামজয়ের দেওয়া ‘ঈশ্বরচন্দ্র’ নামটিও পরবর্তী সময়ে আর বেশি সুপরিচিত ছিল না। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে অর্জিত সাম্মানিক ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিটি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম হয়ে যায়। এই একই উপাধি অনেকে পেয়ে থাকলেও বাঙালির কাছে বিদ্যাসাগর কিন্তু সেই একজনই। পাশাপাশি মানবতার ধর্ম পালনে তিনি আমাদের কাছে আরো দুটি নামে পরিচিত- দয়ার সাগর ও করুণা সাগর। নিজ চরিত্র গুণে ও কর্মের দ্বারা তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ বিদ্যাসাগরকে বাহ্যিক বেশভূষা অর্থাৎ হাঁটুর ওপর কাপড় পরা এবং মাথায় টিকি রাখা দেখে তাঁকে একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলেই মনে করেন। এটা ঠিক যে, তিনি তৎকালীন সমাজকে বুঝতেন। তাই প্রথা মেনে একজন চিরাচরিত ব্রাহ্মণের মতোই পোষাক পরিধান করতেন । কিন্তু তিনি ভেতরে ছিলেন ভারতীয় সমাজে একজন খাঁটি মানবতাবাদী ।

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হয়েও এবং হৃদয়ে অসাধারণ দয়া থাকলেও হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রে তিনি উদাসীন ছিলেন! বিদ্যাসাগরের অপর এক জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, বিদ্যাসাগরের প্রাত্যহিক জীবনে আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ একনিষ্ঠ হিন্দুর মতো ছিল না, এমনকি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের ভাই শম্ভুচন্দ্র মনে করতেন, খুব ছোটোবেলা থেকেই পৌরাণিক দেবতার প্রতি বিদ্যাসাগরের কখনই কোন ভক্তি বা শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি পিতা-মাতাকে হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর ন্যায় অন্তরে রেখে পূজা করতেন। 'পজিটিভিস্ট’ দর্শনে প্রভাবিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নিজের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরকেও ‘নাস্তিক’ বলে দাবি করতেন। আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে অজ্ঞেয়বাদী বলেই আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসুও তাঁকে ‘একেশ্বরবাদী’ এবং ‘সংশয়বাদী’ বলে অভিহিত করেন। রাধারমণ মিত্র বিদ্যাসাগরকে সরাসরি ‘নাস্তিক’ বলেছেন। কারো কারো মতে, তিনি যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না- এমনটা নয়, তবে তিনি হয়তো একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আসলে তার ধর্ম হল মানবধর্ম। যেন মনে হয় বিদ্যাসাগর হয়তো চেয়েছিলেন এমন এক ধর্ম প্রবর্তিত হোক যেই ধর্মে পিতামাতাকে ভক্তি ও সেবা কর্মই হবে মূল। কর্মযোগীরা বিশ্বাস করেন 'কর্মই ধর্ম'। তাঁদের কাছে আলাদা করে কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বিদ্যাসাগর তাঁর সময় এমনকি অনেক আগে থেকেই কুসংস্কার, ধর্মীয় আচার সর্বস্বতা, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরতা প্রভৃতিতে যারপরনাই বিরক্ত হয়ে চিরাচরিত ধর্মাচরণ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনেই ভগবান তুষ্ট হয়ে মানুষের কল্যাণ করবেন- এরূপ ধারণায় তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব যে বিশ্বাসী হবেন না, এটা স্বাভাবিক। 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ড' কে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।”[১]

তিনি যে শুধুমাত্র দুর্বোধ্য বাংলা ব্যাকরণকে সহজবোধ্য করে ‘কৌমুদি’ রচনা করেছেন তা নয়, বরং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলেজে বিশপ বার্কলে রচিত দর্শন পুস্তক ‘ইনকোয়ারি’ পড়ানোর যে

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

সুপারিশ ব্যালেন্টাইন সাহেব করেছিলেন বিদ্যাসাগর তার আপত্তি করে বলেন বার্কলের দর্শন ভ্রান্ত। পাশাপাশি সাংখ্য-বেদান্ত-নব্যন্যায়কে ভ্রান্ত ও অসার বলেছিলেন। এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ আধুনিক যুগে সম্ভব নয়। বরং ছাত্র-ছাত্রীদের মিলের লজিক পড়ানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধার কারণে সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানো হতো। তবে বিদ্যাসাগর মনে করতেন এই দুইয়ের প্রভাব কমানোর জন্য পাশ্চাত্যের কিছু যুক্তিনিষ্ঠ দর্শনের সহযোগিতা নেওয়া প্রয়োজন। যদিও বিশপ বার্কলের এনকোয়ারি পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না কেননা সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করছেন। তাই পাশ্চাত্যেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। তবে বিদ্যাসাগরের কিছু লেখাতে ঈশ্বর নিয়ে লেখা পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত শিশুপাঠ্যে (বিশেষত 'বোধোদয়' ও 'আখ্যানমঞ্জরী') ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণতার মহত্ব উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের তত্ত্বগুলোকে অসার বলে মনে করেন, এবং পুজো অর্চনা করেন না, তিনিই কিন্তু আবার শিশুপাঠ্যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য উল্লেখ করেন, উপবীত ধারণ করেন, পিতার মৃত্যুতে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, চিঠির মাথাতেও দেবতার ('শ্রীদুর্গা', 'শ্রীহরি সহায়') নাম লিখতেন। তাই অনেকের ভাবনা হয়েছিল বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলে চিঠিপত্রে এসব লিখতেন না। অনেকেই এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁকে 'ব্যক্তিগত একেশ্বরবাদী' বলে ঘোষণা করেছেন। আসলে চিঠিপত্রে 'শ্রীহরি সহায়' ইত্যাদি লেখা তখনকার দিনে এক প্রথাগত ব্যাপার ছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে শাস্ত্রীয় বিবাহশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও আচারনিয়ম পালন ছিল নিতান্তই প্রথাগত। তিনি সেই সমস্ত লোকাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন যেগুলো সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু যেগুলো মেনে চললে সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনও বাধা সৃষ্টি করত না বা যেগুলো মেনে চললে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে কোন ক্ষতিই হতোনা সেগুলো লোকাচার ও প্রচলিত নিয়মগুলোর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে নিছকই যান্ত্রিকভাবে পালন করতেন। এককথায় তিনি কোনোদিন লোকাচারের দাসত্ব করেননি যা তিনি নিজেও বলতেন। একইরকমভাবে শিশুপাঠ্যে যদি ঈশ্বর স্বীকৃতি না থাকে তাহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সমাজে এ নিয়ে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে- এই ভাবনা থেকেই তিনি নৈতিকতার পাঠ দিতে গিয়ে ঈশ্বরের অবতারণা ঘটিয়েছেন। কেননা আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে এমনকি এখনও নৈতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেই বিশ্বাস করা হয়। তিনি বোধোদয়ের সর্বপ্রথম অংশ 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ' বিষয়ে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করে লেখেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।"[২]

যদিও বাস্তবে সাম্যবাদী বিদ্যাসাগর পরম দয়ালু ঈশ্বরের অসাম্য নীতি নিয়ে বিচলিত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈশ্বর কি কাউকে বেশি শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? রামকৃষ্ণ এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে একটু এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন- তিনি বিভূরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া আছে, বিদ্যা আছে, অন্যের চেয়ে তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কি না? রামকৃষ্ণের এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বিদ্যাসাগর শুধুই হেসেছিলেন। আসলে রামকৃষ্ণ যেগুলোর কথা বলেছিলেন সেগুলো 'ঈশ্বর' তাকে এমনি এমনি প্রদান করেননি, তার জন্য বিদ্যাসাগরকে কঠোর পরিশ্রম সাধনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি একদিনেই বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগর হয়ে যাননি।

আবার বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে সেই হিন্দু শাস্ত্রের সহযোগিতা নিয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে তিনি প্রচুর শাস্ত্র

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

ঘেটে এর পক্ষের মতামতগুলো বের করতেন, যাতে কেউ তাকে ধর্মশাস্ত্রবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করতে না পারে। কেননা তিনি ধর্মশাস্ত্রবিরোধী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেলে তাঁর কথা মান্যতা পাবে না। শাস্ত্রীয় আইনকে একমাত্র শাস্ত্রীয় আইন দিয়েই খণ্ডন করা সম্ভব। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে শাস্ত্র ব্যাতীত বিধবা বিবাহের সমর্থন পাওয়া মুশকিল। আর ঠিক সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কারণ তাদের ভাবনা ছিল বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র তথা ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ। বিধবা বিবাহের সমর্থনে জনগণের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ লেখেন, পরের বছর ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এমনকি পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখান যে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রসম্মত।

আসলে পাঠ্যসূচিতে হিন্দু দর্শন বা তার কোন একটি অংশের উপস্থিতির বিরোধী তিনি ছিলেন না। হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্যসূচি এমনভাবে নির্ধারিত করা যেখানে হিন্দু দর্শনের সবকটি সম্প্রদায়ের যথাযথ আলোচনা থাকে এবং কোনও বিশেষ সম্প্রদায় অধিক গুরুত্ব না পায়। তাই বিদ্যাসাগর নিজেই মাধবাচার্যের ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ সম্পাদনা করে আবার চার্বাক দর্শনকে সবার সামনে নিয়ে এলেন এবং এই দর্শনের প্রত্যক্ষবাদ প্রচার করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুললেন। আজ যখন দেশ-বিদেশে এই চার্বাক দর্শন নিয়ে আলোচনা চলছে তখন এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি কিন্তু এর শুরুটা করেছিলেন। তাই অনেকেই তাকে চার্বাকবাদী বা জড়বাদী নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে মনে করতেন। আসলে তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের পাঠ এমনভাবে দেওয়া প্রয়োজন যাতে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিচারে সবকিছু না মেনে যুক্তির দ্বারা বিচার করতে পারে। তিনি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত এবং অসার বলেছেন। বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর প্রায়োগিক দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর পৌরাণিক দেব-দেবীর আরাধনা না করলেও তাঁর যে ব্যক্তিগত দেবতা ছিল এবং তার আরাধনা করতেন তার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন- তাঁর প্রিয় লাইব্রেরীতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতীর দেবীর ছবি রাখা থাকত। নিজ খরচে বিদ্যাসাগর গ্রামে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও অল্প খরচে দরিদ্র গরিব মানুষদের চিকিৎসার জন্য নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা শিখে মানুষের সেবায় কাজে লাগাতেন। তিনি নিজে কখনোই পূজা-অর্চনা বা কোনরূপ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করতেন না। পূজা করার খরচ দিয়ে গ্রামের গরিবদের খাওয়ানো মঙ্গলজনক, এই ভাবনাতে তিনি তাঁর বাড়ির দীর্ঘদিনের জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করে দেন এবং তাঁর মাতাও এতে সম্মতি প্রদান করেন। বিদ্যাসাগরের মা দারুণভাবে বাস্তববাদী ছিলেন যার প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপর পড়েছিল। বিদ্যাসাগরের পিতার প্রচণ্ড ঈশ্বরপ্রীতির কারণ তাঁর মা কোনভাবেই বুঝতে পারতেন না। একবার তাঁর মা ঈশ্বরকে কটাক্ষ করে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, ‘ভাগ্যে উপোস থাকলেও লেখা থাকে বুঝি!’ তাঁর বাবা মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন, ‘ওঁর ইচ্ছেয় সব হয়। অধীর হলে চলে না। আমরা সংসারী মানুষ, তাঁর মহিমা কতটুকু বুঝি’। [৩]-চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে সব শেষ হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে শুধু ‘ভগবান’ ‘ভগবান’ করবে এমনটা তিনি চাইতেন না। তিনি স্বর্গ ও মোক্ষ চাননা। তিনি মনে করতেন তাঁর ভগবান আছেন এই মাটির পৃথিবীতেই। ঈশ্বর বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা আরেকটু স্পষ্ট হয় রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের বহু চর্চিত সেই সাক্ষাৎকার থেকে। যদিও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রামকৃষ্ণের কৌতূহল মেটেনি। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারেননি বিদ্যাসাগরের মতো বড় মাপের জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি এত দান-দক্ষিণা করেন তিনি কীভাবে ঈশ্বরচিন্তাবিমুক্ত হতে পারেন। তাই সাক্ষাতের পর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আরও দু-একবার তাঁর বিদ্যাসাগরকে দেখা দরকার। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁর হয়নি। রামকৃষ্ণদেব অধীর অপেক্ষায় ছিলেন

বিদ্যাসাগরের দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার। রামকৃষ্ণ দেবের মুখের ওপর না বলতে পারেননি তাই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যাবেন। যদিও যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ বিদ্যাসাগর ভবিষ্যতে কখনো রামকৃষ্ণদেবের কাছে বা মন্দিরে যাবার প্রয়োজন মনে করেননি। রামকৃষ্ণ কথোপকথনের মধ্যে বিদ্যাসাগরকে বোঝালেন যে বিদ্যাসাগরের সেবাকর্ম একপ্রকার সাত্বিক কর্ম। বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থভাবে বিদ্যাদান ও অন্নদান করছেন। এটি নিষ্কাম কর্ম যার দ্বারা ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য আবার কেউ করে পুণ্যের জন্য, তাদের সেই কর্ম নিষ্কাম নয়। তাই এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সিদ্ধ। ধর্ম-বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাউকেই কোনরূপ শিক্ষা দিতেন না যদিও তিনি দর্শনের গ্রন্থ পড়েছেন। একবার বিদ্যাসাগর ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ঈশ্বরকে তো জানবার উপায় নেই। তাই আমাদের কর্তব্য হল, আমাদের এরূপ হয়ে ওঠা যাতে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ভাবনা আরো ভালো করে বোঝা যায় তাঁর জীবনের আরেকটি ঘটনা থেকে। বিদ্যাসাগরের পিতা-মাতা যখন কাশীতে একবার তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাশীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে বিখ্যাত মানুষ বলে কিছু টাকা-পয়সা দান করতে বললেন এবং তারা এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আজ বিদ্যাসাগর যা কিছু পেয়েছেন ও হয়েছেন তা ঈশ্বরের কৃপায়। বিদ্যাসাগর জানান, তিনি কাশী দর্শন করতে আসেননি, এসেছেন পিতৃদর্শনের জন্য। প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি তাহলে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না? বিদ্যাসাগর বলেন- তিনি কাশী মানেন না এবং তাদের বিশ্বেশ্বরকেও নন। তখন ব্রাহ্মণেরা রেগে গিয়ে জানতে চান যে তিনি তাহলে কী মানেন? বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেন তাঁর বাবাকে বিশ্বেশ্বর এবং মাকে অন্নপূর্ণা হিসেবে মানেন।

চিরাচরিত ধর্মের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই প্রকার উদাসীনতা অনেককেই প্রভাবিত করেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত ‘ তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন ধর্মপ্রচারে সীমাবদ্ধ না রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে এবং এতেই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। অক্ষয় দত্তের পক্ষে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতার কারণেই। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা- বিষয়ে যে পুস্তিকাটি লেখেন সেটিও ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় ছাপা হয় এবং অক্ষয় দত্ত এর সমর্থনে সম্পাদকীয় লিখেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মধ্যেই যুক্তি খুঁজে বের করে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলোর বিরোধিতা করতেন তাতে তাঁর বিরোধিতা জনসমর্থন লাভ করে। অক্ষয় মনে করতেন বেদ-বেদান্ত ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম নয়। বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে অক্ষয় দত্তের এরূপ অভিমত বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করেছিল। যদিও এতে অনেকেই বিরক্ত ছিলেন তাঁদের দুজনের ওপর। দেবেন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, ‘কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।’[৪]

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মজা করতেন। একবার আলোচনা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের শিষ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি শ্রীম নামে খ্যাতি অর্জন করেন তাকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, চেঙ্গিস খাঁ যখন লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করলেন, তখন তো ঈশ্বর আটকালেন না, শুধুই বসে বসে দেখলেন! তাই এমন ঈশ্বর থাকলেও মানুষের কীসের উপকার? সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বর যদি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বা নিপীড়ন নাই থামাতে পারেন, তাহলে তিনি যে আদৌ আছেন এটাই বা কীভাবে বোঝা যাবে?[৫]- এই প্রশ্নগুলো তিনি বিভিন্ন সময়ে বারবার তুলতেন। আরেকটি মজার ঘটনা যেখানে বিদ্যাসাগর ‘পরলোক’ নিয়ে মজা করেছিলেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশীভূষণ বসু এক বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাবার পথ ভুলে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছলেন। ব্যাপারটি জানতে পেরে বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বললেন, তুমি যখন তোমার পরিচিত স্থানীয় জায়গাতেই রাস্তা ভুলে এক

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বৃদ্ধকে এতো ঘোরালে, তখন অজ্ঞাত পরলোকের পথে কেন সবাইকে পাঠানোর চেষ্টা করছো? এতে তো তাদের আরও দুর্দশা বাড়বে, কাজেই এই কাজ ছাড়ো এবার। আরেকটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একবার এক পাদ্রী সাহেব কিছু তরুণকে খ্রিস্ট ধর্মের কথা বোঝাচ্ছিলেন সেইসময় বিদ্যাসাগর ওই পাদ্রীকে বললেন, ওদের বয়স কম তাই এখন ওদের পরকালের কথা ভাবার সময় নেই। বরং বিদ্যাসাগরকে বলতে পারেন কেননা তাঁর পরকালের সময় হয়ে গেছে। এটা তিনি মূলত ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, তিনি পরলোকে বিশ্বাস করতেন না। যদিও পাদ্রী সাহেব বিদ্যাসাগরের এই বৌদ্ধিক রসিকতা না বুঝে তৎক্ষণাৎ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে তার ধর্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে উদ্যত হয়েছিলেন। এতে বিদ্যাসাগর আরো হাসিঠাট্টায় মেতে উঠলে একটা সময় পাদ্রী বিষয়টা বুঝতে পেরে রেগে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলেন এবং অভিশাপ করতে লাগেন। শশধর তর্কচূড়ামণি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করলে বিদ্যাসাগর ধর্মতত্ত্বের দুর্বোধ্যতার কথা বলেন। তিনি তাঁর ছাত্রাবস্থায় হিন্দু দর্শন পড়ানোর দায়িত্বে থাকা এক পণ্ডিতমশাইয়ের কথা তুলে ধরেন যিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি ঈশ্বর বলতে কী বোঝেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমনই বুঝি, যেমন পড়াচ্ছেন পড়িয়ে যান’। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য পুণ্য অর্জনের জন্য জীবনের শেষ কালে কাশীবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হলে বিদ্যাসাগর তাকে গাঁজা খাওয়া শুরু করতে বললেন। হরানন্দ কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদ্যাসাগর যুক্তি দেন যে কাশীতে মরলে শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটবে আর তখন গাঁজাটাও খেতে হবে, কাজেই আগে থেকে অভ্যাসটা করে রাখা ভালো। আসলে তিনি এটা চিরাচরিত অযৌক্তিক ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

১৮৬৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি বাংলা অভিধান ‘শব্দমঞ্জরী’ প্রকাশ করেন যেখানে ‘ধর্ম’ শব্দটির একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন ধর্ম হল সৎকর্মের অনুষ্ঠান জন্য গুণবিশেষ এবং অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্তি। অবশ্য কর্তব্য কর্ম, যে কর্ম না করলে অধর্ম হয়। যেমন পরের উপকার করা মানুষের ধর্ম।[৬]-মানুষ ও সমাজ ছিল তাঁর কাছে মূল বিষয় যেভাবে আমাদের কাছে ঈশ্বর অভিষ্ট বিষয়। কোনো কর্মের মাধ্যম হিসেবে ঈশ্বর বিশ্বাস তিনি করতেন না। তাঁর চিন্তা ভাবনায় ধর্ম ও ঈশ্বর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে ধর্মের প্রতি তাঁর কোন আস্থা না থাকলেও নীতিবোধের ওপর ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাস ও ভরসা। নীতিবোধ থাকলে কোনরূপ ঈশ্বর বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী না হলেও একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি প্রকৃত কোন মতাদর্শ বা ভাবনার ছিলেন তা আমাদের মতো কোন সাধারণ ব্যক্তির বোধগম্য নয়। তিনি কী ছিলেন তা একমাত্র তিনি নিজেই জানতেন। চিরাচরিত পথে চলতেন না বলেই তাঁকে ধরাবাঁধা কোনো ছাঁচে ফেলা মুশকিল। তাঁর মতোন ব্যক্তিত্ব চিরকালের জন্যই মানুষের কাছে রহস্যময় বিষয় হয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এটা স্পষ্ট যে তিনি দারুণভাবে বাস্তববাদী ও পরহিতবাদী ছিলেন। সকলের উপকার সাধনই ছিল তাঁর ধর্মের লক্ষণ।

তথ্যসূত্র

১. পারমিতা, প্রজ্ঞা, (আগষ্ট, ২০১৯), ঈশ্বরের ঈশ্বর এবং ঈশ্বর গুপ্তের দল, শিলাদিত্য, দ্বিতীয় সংখ্যা- অষ্টম বর্ষ, পৃ:১৪
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, (২০১১), বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র, কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ: অশোক বুক এজেন্সি, পৃ:১৫৯
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, (২০১৭, নভেম্বর ১), বিদ্যাসাগর এবং ঈশ্বরের খোঁজে, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, পৃ:৬
৪. ঘোষ, সেমন্তী, (২০১৯, সেপ্টেম্বর ২৯), কোলাহলের বাইরে, আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ:৪
৫. সরকার, পবিত্র, (সেপ্টেম্বর, ২০১৯), বিদ্যাসাগর: ধর্মবিশ্বাস, দেশ হিতৈষী, শারদ সংখ্যা, পৃ:১০১
৬. পাল, সন্দীপ, (২০১৯), বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তা, ঢাকা, বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ:২০